ঘুরে এলাম ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর

ডক্টর মোহাম্মদ ইদ্রিস

‘রূপে ঝলমল, রূপালী ইলিশ, নয় নয় বেশী দূর। এখানে এলেই দেখা মেলে তার, এই সেই চাঁদপুর। পদ্মা, মেঘনা, ডাকাটিয়া নদী মিলেছে এখানে এসে। শুনতে পাবে তাদের কল্লল, মাঝি মাল্লার সূর, এই সেই চাঁদপুর।’

ঢাকার দূষিত বুড়িগঙ্গা পার হয়ে ধলেশ্বরী নদী। ধলেশ্বরী নদী থেকে নীল জলরাশির সৌন্দর্যমন্ডিত প্রবাহমান আরেকটি বিশাল নদী। নদীর অসংখ্য নৌযান এবং জাল ফেলে জেলেদের মাছ ধরা আর জালে ধরাপড়া ইলিশের লাফালাফি। কী চমৎকার দৃশ্য! মনে হবে আপনি কোনো সমুদ্রে আছেন। না এটি কোন সমুদ্র নয়। এটি মেঘনা নদীর পাড়ের ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর। এ নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবেই। এ নদীতে চাঁদপুর যেতে আপনাকে মোহিত করবেই। লঞ্চ ভ্রমণে নদীতে জ্যান্ত ইলিশের নড়াচড়া কখনই ভোলা যায় না। ইলিশের বাড়ি চাঁদপুরে যেতে তাই নদীপথে যাওয়াই সবচেয়ে উত্তম। নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আপনি যে কখন চাঁদপুর পৌঁছে যাবেন, সেটি বুঝতেও পারবেন না। চাঁদপুরের ভাজা ইলিশ মাছ ও মাছের ডিমের স্বাদ ও ঘ্যাণ অনেকদিন পর্যন্ত আপনার মনে থাকবে। কাঁচা মাছের গন্ধও আপনাকে মাতাল করে ফেলবে। মেঘনা নদীর পাড়ের ইলিশের বাড়ি ভ্রমণের উপযুক্ত সময় হলো বর্ষাকার। বর্ষার নদী থাকে নব যৌবনা। উথলপাথাল ঢেউয়ের দোলায় পাবেন দারুণ রোমাঞ্চকর অনভূতি।

পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিযা নদীর তীরে অবস্থিত চাঁদপুর জেলা শহর। ইলিশ মাছের অন্যতম প্রজনন অঞ্চল হিসেবে চাঁদপুরকে ইলিশের বাড়ি বা ‘সিটি অব হিলশা’ নামে অভিহিত করা হয়। চাঁদপুর জেলার উত্তরে মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও বরিশাল জেলা পূর্বে কুমিল্লা জেলা এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী ও শরিয়তপুর জেলা অবস্থিত। বার ভূঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায়ের দখলে ছিল। এ অঞ্চলে তিনি একটি শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। চাঁদপুর মহকুমা ১৮৭৮ সালে গঠিত হয় এবং পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৯৭ সালে। এটি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার অংশ বিশেষ ছিল। ১৯৮৪ সালে এটিকে জেলা হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। চাঁদপুরের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ঐতিহাসিক জে এম সেনগুপ্তের মতে, জমিদার চাঁদরায়ের নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে চাঁদপুর। কারো মতে, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক দিল্লী থেকে পঞ্চদশ শতকে এখানে এসে একটি নদী বন্দর স্থাপন করেছিলেন। তার নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম করণ করা হয়েছে চাঁদপুর। আবার কারো মতে, চাঁদ ফকির নামের একজন সূফী-সাধকের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম করণ করা হয়েছে চাঁদপুর।

চাঁদপুর জেলায় আটটি উপজেলা রয়েছে সেগুলো হলো- চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ। চাঁদপুর জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে বিশেষ ভ্রমণ স্থান হলো বা বড়স্টেশনের

পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া তিন নদীর মিলনস্থল চাঁদপুর মোহনা। বাংলাদেশের একমাত্র মৎস গবেষণার নদী কেন্দ্রের সামনের শপথ চত্বর থেকে এর দূরত্ব প্রায় দেড় কিলোমিটার। রিকশা, অটোরিকশা বা নিজস্ব গাড়ি নিয়ে বড়স্টেনের নদীর মোহনায় যাওয়া যায়। চাঁদপুর জেলার ঐতিহ্যের প্রতীক ইলিশ চত্বর যা চাঁদপুর জেলার বাসস্ট্যান্ডের পাশে এবং স্টেডিয়াম সামনে অবস্থিত। চাঁদপুর জেলার আরো দর্শনীয় স্থান হলো মিনি কক্সবাজার, হাজীগঞ্জ মসজিদ, হযরত শাহরাস্তি (রহ.) এর সমাধি, রূপসা জমিদার বাড়ি, লোহাগড়া মঠ, কচুয়ার বখতিয়ার খান মসজিদ, আলমগীরী মসজিদ, চাঁদপুর বন্দর, হরিণা ফেরীঘাট, চাঁদপুর কলেজ ক্যাম্পাস, মতলব ব্রীজ ইত্যাদী।

যেতে পারবেন যেভাবে: রাজধানী ঢাকা থেকে চাঁদপুরের দূরুত্ব ১৬৯ কিলোমিমিটার। রেল, সড়ক ও নৌ পথে চাঁদপুরে যাওয়া যায়। ঢাকার মহাখালী কমলপুর ও সায়দাবাদ বাস টার্মিনার থেকে কুমিল্লা হয়ে চাঁদপুরে যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্য যেসব গাড়ি ছেড়ে যায় সেগুলোর মধ্যে পদ্মা এক্সপ্রেস ও মতলব এক্সপ্রেস অন্যতম। এ ছাড়া সহজ পথে ঢাকার সদরঘাট হতে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বেশ কিছু লঞ্চ চাঁদপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। সুবিধামতো যে কোনো একটিতে চড়ে বসতে পারেন। এসব লঞ্চে ঢাকা-চাঁদপুর অথবা চাঁদপুর-ঢাকার ভাড়া প্রথম শ্রেণির একক কেবিন ৩০০-৫৫০ টাকা। প্রথম শ্রেণির দ্বৈত কেবিন ৬০০-১০০০ টাকা। ডেকের ভাড়া জনপ্রতি ১০০-১৫০ টাকা। এ ছাড়া বাসে কুমিল্লা হয়ে আসা যায়। চাঁদপুর জেলার আওতাধীন ২০৩ কিলোটার নৌপথ রয়েছে, যা দিয়ে বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিবহন করা হয়। ঢাকা সদরঘাট নদী বন্দর লঞ্চ টার্মিনাল থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্য যে কয়েকটি লঞ্চ ছেড়ে যায় তার মধ্যে আব-এ-জমজম, রফ রফ, ময়ূর-১, ময়ূর-২, আল বোরাক, মেঘনা রাণী, ইমাম হাসান ইত্যাদি লঞ্চ উল্লেখযোগ্য। চট্রগ্রাম থেকে চাঁদপুর যাওয়ার সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হল ট্রেন। এ রুটে সাগরিকা ও মেঘনা এক্সপ্রেস নামের দুটি ট্রেন রয়েছে। মেঘনা বিকাল ৫টায় ও সাগরিকা সকাল ১০টায় চট্রগ্রাম আমতলী রেলওয়ে স্টেশেন থেকে ছেড়ে আসে। ভাড়া ১৫০ টাকা।

যাত্রা শুরু যেভাবে: ভোলার দ্বীপ কুকরি-মুকরিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সফর সঙ্গীদের বিদায় জানিয়ে ১৪ অক্টোবর ভোলা মনপুরার সোহাগ ভাইয়ের পরামর্শে তারাতারি ঢাকায় ফেরা জন্য লঞ্চে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলাম। ঢাকায় ফেরার পথে সি লাইন লঞ্চ ছিল আড়াইটায়, আর কর্ণফুলি লঞ্চে ছিল তিনটায়। ভোলা শহর থেকে ইলিশাঘাটে সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় আসতে জ্যামে পরে গেলাম। অবশেষে দুইটা লঞ্চই ফেল করলাম। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না, কিভাবে ফিরে আসব। অবশেষে মাহবুব ভাইকে ফোন দিলাম। ভোলা থেকে মজু চৌধুরীর ঘাট পার হয়ে তাঁর পরামর্শে ফরিদগঞ্জ চলে গেলাম। অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই বিশ বছর পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একান্ত প্রিয়বন্ধু মাহববুর রহমানের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর সাথে চাঁদপুর ভ্রমণ। এজন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া জানাই।

ইলিশের বাড়ি: আমাদের রুপালি সম্পদ 'ইলিশ'। চাঁদপুরের ইলিশ শুনলেই কার না জিভে পানি আসে? চাঁদপুরের কৃতী সন্তান দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পী হাশেম খানের হাতে গড়া 'ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর' নামে লোগোটি চাঁদপুর জেলার ব্র্যান্ডিং লোগো হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এখানে প্রতিবছর ধরা পড়ে অসংখ্য ইলিশ। আর এ জন্যই চাঁদপুরে গড়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তম ইলিশের বাজার। দেশের নানা প্রান্ত থেকে এই ইলিশবাজারে মানুষ ইলিশ খেতে ও কিনতে আসে। এক জেলা এক পণ্য-সরকারের এ নীতি অনুসরণে চাঁদপুরকে ইলিশের শহর ঘোষণা করা হয়েছে।

অবশ্য বরিশাল-লক্ষ্মীপুর ও ভোলাতেও রয়েছে ইলিশের অনেক মোকাম। চাঁদপুর বড়স্টেশন মোকামের সব ইলিশই চাঁদপুরের নয়। এখানে বরিশাল, ভোলা কিংবা সামুদ্রিক ইলিশও রয়েছে। চাঁদপুরের ইলিশ চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এখানকার ইলিশ একেবারে রুপালি রঙের হয়ে থাকে। আর অন্যান্য জায়গার ইলিশে রুপালি রঙের সঙ্গে লালচে আভা দেখা যায়। লোনা পানির ইলিশে রুপালি রঙের সঙ্গে লালচে আভা থাকে।

ইলিশ মাছ চাঁদপুরের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত খাবার। শহরের আনাচে-কনাচে পাবেন ইলিশ মাছের ঘ্রাণ। লঞ্চ থেকে নেমে ঘাটের পাশে, শহরের ভেতর কালীবাড়ি মোড়ে, হকার্স মার্কেটের সামনে এবং বাস স্ট্যান্ডের প্রবেশ মুখে অনেক খাবার হোটেল আছে। এগুলোতে ইলিশ মাছের চপ, কাবাব, রান্না করা, ভর্তা করা ও ফ্রাই করা বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন দামের ইলিশ মাছের তৈরী খাবার পাওয়া যায়। রেষ্টুরেন্ট হিসাবে স্টেডিয়ামের পাশে ইলিশ চত্বরের 'ক্যাফে ঝীল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাঁদপুরের মিষ্টিও অত্যান্ত সুস্বাদু। উল্লেখযোগ্য মিষ্টি বিপনী হলো কালীবাড়ি মোড়ে ওয়ান মিনিট, পাল বাজারের পাশে সুইট হোম, জোড় পুকুর পাড় এবং ইলিশ চত্বরে মৌসুমী সুইটস্। শহরের বাইরে নামকরা ফরিদগঞ্জ বাজারে আছে আউয়ালের রসমালাই, আর মতলব বাজারে আছে গান্ধী ঘোষের ক্ষীর। চটপটি-ফুঁচকা, ঝালমুড়ি ইত্যাদী পাওয়া যাবে শহরের মাতৃপীঠ স্কুলের সামনে হ্রদের পাড়ে, পাল বাজার ব্রীজের উপরে ও বড় ষ্টেশনের মোল হেড চত্বরে। চায়ের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মোল হেড চত্বরে মসজিদের পাশে বিসমিল্লাহ টি স্টল। সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে বসে এক কাপ মনের মত চা পাবেন সেখানে।

রূপসা জমিদার বাড়ী, ফরিদগাঞ্জঃ ১৫ অক্টোবর' ২০২১ জুময়া বার। মাহবুব ভাইয়ের সাথে সকালের নাস্তা সেরে তাঁর গ্রামের বাড়ী রূপসার দিকে রওয়ানা হলাম। উপজেলা শহর ফরিদগাঞ্জ থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে রূপসা গ্রামটি অবস্থিত। মাহবুব ভাইয়ের গ্রামের বাড়িটি যেন কবি জসিম উদ্দিনের ভাষায় 'গাছের ছায়ায়, লতায় পাতায় উদাসী বনের ধায়' উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাবা-মার কবর জিয়ারত করা। যেহেতুে তাঁর কাছ থেকে জানলাম গত মাত্র দুইমাস আগে তিনি মমতাময়ী মাকে হারিয়েয়েছন। গ্রামের বাড়িতে তাঁর বাবা-মার কবর জিয়ারত শেষ করে এ গ্রামে অবস্থিত কালের বাস্তবর সাক্ষী জমিদার বাড়ীতে প্রবেশ করলাম।

ঐতিহাসিক সুত্র থেকে জানাযায়, চাঁদপুর অঞ্চলের বেশীরভাগ জনপদগুলোতে যখন উন্নত সভ্যতা আলোর ছোয়া পায়নি। চাঁদপুর জেলার সুপ্রাচীন জনপদ ফরিদগঞ্জ উপজেলার এ রূপসা গ্রামটি তখনও স্নিগ্ধতায় সমৃদ্ধ ছিলো। সমৃদ্ধশালী এ গ্রামটির গৌরবময় ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে ঐ গ্রামেরই ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারের ইতিহাস। উনিশ শতকের প্রথমভাগে মোহাম্মদ গাজী এ জমিদার পরিবারের পত্তন করেন। প্রকৃত অর্থে মোহাম্মদ গাজীর সুযোগ্য পুত্র আহমেদ গাজী চৌধুরীর সময়কালেই এ জমিদার পরিবারের বিস্তৃতি ঘটে। সাধারণভাবে জমিদার বলতেই সাধারণ মানুষের মনে যে নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে, কিন্তু আহমেদ গাজী সে ধরনের জমিদার ছিলেন না। প্রজা হিতৈসী এ জমিদার তার কাজের মাধ্যমে নিজেকে একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও ইসলাম প্রচারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন। দয়া ও দানশীলতাই ছিলো তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তিনি অনেক জমি ওয়াকফ করে যান। তাঁর ওয়াকফকৃত জমির মধ্যে লাউতলীর দিঘি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষানুরাগী এ জমিদার অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম। ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে তিনি অকৃপণভাবে অনুদান প্রদান করতেন। জমিদার বাড়ীতে অবস্থিত রূপসার সুপ্রাচীন জামে মসজিদ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার বাড়ি মসজিদটির চারকোণে আছে চারটি অষ্টভুজাকৃতি পার্শ্ব-বুরুজ। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে গম্বুজের নিচে চারদিকে ঘিরে ও মেহরাবের মধ্যে ফুল, লতা-পাতার নকশা লক্ষণীয়। তাছাড়া আরো অনেকগুলো মাদরাসা ও মসজিদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার আহমেদ গাজী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আহম্মদিয়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং রূপসা আহম্মদিয়া মাদ্রাসা আজো তাঁর কীতির সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছে। রূপসা জমিদার বাড়ী ও মসজিদ পরিদর্শন শেষে এখানে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করে আমরা হাজীগঞ্জ মসজিদ পরিদর্শন করার জন্য হাজীগঞ্জের পথে রওয়ানা হলাম। কিন্তু জুময়ার নামাজের সময় আসন্ন হওয়ায় আমরা হাজীগঞ্জ মসজিদে গিয়ে জুময়ার নামাজ আদায় করতে পারলাম না। অবশেষে আমরা গৃদ কালিন্দিয়া বাজার মসজিদে জুময়ার নামাজ আদায় করলাম।

লোহাগড়া মঠ, ফরিদগঞ্জঃ ফরিদগঞ্জ উপজেলার রয়েছে আরো একটি প্রাচীন নিদর্শন, প্রায় সাত শতাব্দীর পুরাতন প্রাচীন লোহাগড়া মঠ। উপজেলার লোহাগড়া গ্রামে ডাকাতিয়া নদীর পাশে মঠটি অবস্থিত। যা লোহাগড়া জমিদার বাড়ির জমিদাররা তৈরি করেছিলেন। লোহাগড়া জমিদার বাড়ির দুইজন জমিদার লৌহ এবং গহড় নামানুসারে এলাকাটির নাম রাখা হয় লোহাগড়। জমিদারদের নামানুসারে গ্রামের সাথে মিল রেখেই তাদের স্থাপত্যশৈলিরও নাম রাখা হয় লোহাগড়া মঠ। আজ থেকে প্রায় সাত'শ বছর পূর্বে লোহাগড়া জমিদার বাড়ির জমিদাররা এই এলাকাটিতে রাজত্ব করতেন। মঠের মত বিশালাকার দুটি প্রাসাদ। এই প্রাসাদেই জমিদাররা তাদের বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। বিভিন্নত তথ্যে যানা যায় প্রতাপশালী দুই রাজা লৌহ এবং গহড় ছিলেন অত্যাচারী রাজা। তাদের ভয়ে কেউ মঠ সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে যেতে শব্দ করতেন না।

শাহরাস্তি (রঃ) এর সমাধিঃ শাহরাস্তি উপজেলার রয়েছে একটি প্রাচীন নিদর্শন, শাহরাস্তি (রঃ) এর সমাধি। রাস্তি শাহ হলেন বাংলাদেশের চাঁদপুর এলাকার একজন ইসলাম প্রচারক ব্যক্তিত্ব। তাঁর নামানুসারেই শাহরাস্তি উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। সমাধিতে রক্ষিত একটি বোর্ড থেকে জানা গেছে রাস্তি শাহ-এর জন্ম ১২৩৮ সালে ইরাকের বাগদাদে। তিনি ছিলেন বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর নিকট আত্মীয়। ১৩৫১ সালে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ এবং বাংলার সুবেদার ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে শাহজালাল যেই ১২ জন ইসলাম ধর্ম প্রচারককে সঙ্গে নিয়ে এদেশে আসেন, রাস্তি শাহ্ তাদের অন্যতম। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম ইয়ামেন আসেন, সেখান থেকে পরবর্তীতে এদেশে আসেন। এদেশে আসার সময় তার অন্যতম সহচর ছিলেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ মাহবুব।

বখতিয়ার খান মসজিদ, কচুয়াঃ বখতিয়ার খান মসজিদ চাঁদপুর জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের একটি প্রাচীন মসজিদ ও অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা। এটি কচুয়া উপজেলার উজানী নামক গ্রামে অবিস্থত। মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ-এর শাসনামলে ১১১৭ হিজরী সনে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন সময়ে ফৌজদার বখতার খাঁ নামক এক ব্যক্তি ওই এলাকা শাসন করতেন, তিনিই এ মসজিদটি নির্মাণ করেন বলে মসজিদের শিলালিপি পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হওয়া যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মসজিদের পাশে দুটি দিঘীর অস্তিত্ব ছিল যা বর্তমানে নেই। স্থানীয়দের অর্থায়নে এ মসজিদে কালক্রমে বেশ কিছু সংস্কার করা হয় ও বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করে। মসজিদের দেয়ালে প্রাপ্ত শিলালিপিতে লেখা রয়েছে, খাদেম শেখ বখতার খাঁ এবনে ইলিয়াছ খাঁর নাম।

হাজীগঞ্জ মসজিদ: হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ এর অবস্থান চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার হাজীগঞ্জ বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে। এই মসজিদটিকেই চাঁদপুর জেলার সবচেয়ে পুরোনো মসজিদ বলে মনে করা হয়। এই মসজিদটির প্রথম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হাজী আহম্মদ আলী পাটওয়ারী। মসজিদটি তৈরি করার সময় হাজীগঞ্জ বা এর আশাপাশের কোনো এলাকাতে কোনো ইট ভাটা ছিলোনা। তখন মসজিদটির উদ্যোক্তা সেখানে একটি ইট ভাটা তৈরি করেন। তারপর সেখানে ইট তৈরি করে সেই ইট দিয়ে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য জাহাজ ভাড়া করে ভারতের কলকাতায় গিয়ে লোহার বীম ও পাথর কিনে আনেন। মসজিদটির পাশাপাশি রয়েছে আলীয়া মাদ্রাসা, হাফেজীয়া মাদ্রাসা, ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ও ইসলামীা পাঠাগার। মসজিদটি দুই তলা বিশিষ্ট, ১টি ১২১ ফুট লম্বা মিনার ও ২টি গুম্বজ রয়েছে।

আলমগীরী মসজিদ, হাজীগঞ্জ: সম্রাট আলমগীরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত অলীপুর শাহী মসজিদ চাঁদপুর জেলার অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। এ মসজিদকে আলমগীরী মসজিদ বলা হয়। মসজিদের প্রবেশপথের ওপরে নাস্তালিক লিপিতে ফারসি ভাষায় লেখা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, জনৈক আবদুল্লাহ ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব এর শাসনামলে এটি নির্মাণ করেন। চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার ওলীপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আলমগীরী মসজিদ। একই এলাকায় আরেকটি প্রাচীনতম শাহ শুজা মসজিদ রয়েছে। তবে আলমগীরী মসজিদএকাধিক সংস্কারের ফলে প্রাচীনতম কিছু বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে।

মতলব ব্রীজ: ১৫ অক্টোবর সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছি চাঁদপুরের বিভিন্ন স্পটে। গোধুলী লগ্নে মতলব ব্রীজের সামনে আমার সাথে মাহবুব ভাই সহ আরো ছিলেন গৃদ কালিন্দিয়া কলেজের অধ্যাপক ইমদাদুল হক স্যার, আব্দুর রশিদ

একাডেমীর অধ্যক্ষ জনাব রশিদুল ইসলাম স্যার ও ডাঃ ইমরান স্যার। মতলব বাজার হতে সামান্য পুর্বদিকে এ ব্রিজটি অবস্থিত। ব্রিজটি খুব বেশী বড় না হলেও বিলের মাঝখান দিয়ে তৈরী প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তাটি খুবই দৃষ্টিনন্দন। মতলব বাজারে মাগরিবের নামাজ আদায় করার পর আমাদের আমাদের টার্গেট ছিলো এ বাজারে গান্ধী ঘোষের দোকানের মিষ্টি খাওয়ার। কিন্তু শুক্রবার বাজার বন্ধের দিন হওয়ায় আমাদের সে আশা পূরণ হল না। অবশেষে আমরা চাঁদপুর শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। স্টেডিয়ামের পাশে ইলিশ চত্বরের 'ক্যাফে ঝীল' রেষ্টুরেন্টে এসে নান রুটি ও কাবাব দিয়ে রাতের ডিনার শেষে এশার নামাজ আদায় করে আমরা মোল হেড বা বড় ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম।

তিন নদীর মোহনা: চাঁদপুর জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে বেশী উপভোগ্য স্থান হলো বা বড়স্টেশনের পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া তিন নদীর মিলনস্থল চাঁদপুর মোহনা। শপথ চত্বর থেকে এর দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। রিকশা, অটোরিকশা বা নিজস্ব গাড়ি নিয়ে বড়স্টেনের নদীর মোহনায় যাওয়া যায়। পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিযা নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত এ স্থানকে চাঁদপুরের মোল হেড বলা হয়। এখানে মুক্ত হাওয়ার কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার পর মোল হেড চত্বরে মসজিদের পাশে বিসমিল্লাহ টি স্টলে এসে বসলাম। চাঁদনী রাতে নদীর পাড়ে বসে এক কাপ মনের মত চা পান শেষে মিনি কক্সবাজার ও হরিণা বন্দরঘাটের দিকে রওয়ানা হলাম।

মিনি কক্সবাজার: মেঘনার চর বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায় সদর উপজেলার রাজরাজেশ্বর ইউনিয়নে অবস্থিত একটি পর্যটনকেন্দ্র। এটি নদীকেন্দ্রিক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যটন কেন্দ্র। এর চারদিকে নদী হওয়াা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের মতো দেখায় তাই পর্যটকরা এর নাম দিয়েছেন মিনি কক্সবাজার। স্থানীয়ভাবে বালু চর, পদ্মার চর ও মেঘনার চর নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। 'স্বপ্ন ট্যুরিজম' নামক প্রতিষ্ঠান এই পর্যটনকেন্দ্রটি পরিচালনা করে। চাঁদপুর ত্রিনদী মোহনা বড়স্টেশন মোলহেড থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে মেঘনার দক্ষিণ পূর্ব অংশে অবস্থিত এটি একটি বালুময়ভূমি। নদীপৃষ্ঠ থেকে কিছুটা উঁচু হওয়ায় শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমের ভরা জোয়ারেও এটির পুরো অংশ পানিতে ভেসে যায় না। বছরজুড়ে পর্যটকদের আনাগোনা থাকে। ২০১৮ সালের শুরুর দিক থেকে এটি ধীরে ধীরে মানুষের কাছে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

নদীর ভাঙা-গড়ার মধ্যেই প্রাকৃতিকভাবে এই স্থানটির উৎপত্তি। দূর থেকে স্থানটি দক্ষিণ পূর্বাংশে চাঁদপুর জেলা শহরকে এবং এর বিপরীত দিকে ছোট আকৃতিতে শরীয়তপুর জেলাকে অনুধাবন করা পর্যটন কেন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ। শীত মৌসুমে এবং গ্রীষ্মের আগ পর্যন্ত এ পর্যটন কেন্দ্রের সৌন্দর্য ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদের মন কাড়ে। এ স্থানটি পদ্মা ও মেঘনার মিলনস্থলে অবস্থান হওয়ায় দু'দিকে মেঘনা ও পদ্মার বিস্তীর্ণ জলরাশির ছোট ছোট ঢেউ আর বালুকাময় বিস্তীর্ণ চরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পর্যটকরা এখানে ভিড় করে। সকালে বা বিকেলে এসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয়টির দৃশ্যই এখান থেকে দেখা যায়।

চাঁদপুর বন্দর ও হরিণা ফেরীঘাটঃ চাঁদপুর বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীবন্দর। রেল নদী ও সড়ক পথের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বন্দরটিকে অবিভক্ত বাংলার সিংহদ্বার বলে আখ্যায়িত করা হতো। এই বন্দরটি মেঘনা নদী এর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এই বন্দরটি এখন পণ্য দ্রব্য ও পরিবহন ছাড়াও যাত্রী পরিবহনকারী বন্দর হিসাবে কাজ করছে। এই বন্দর থেকে ঢাকা ও বরিশাল রুটে জাহাজ বা যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল করে। চাঁদপুর বন্দর প্রতিষ্ঠার সঠিক সময় জানা যায়নি, তবে অনুমান করা হয় এই বন্দরটি হাজার বছরের পুরোনো। ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মেজের রেনেলের আঁকা মানচিত্র থেকে জানা যায় বন্দরটির পূর্ব নামছিল নরসিংহপুর।

এই বন্দরটি মেঘনা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ক্রমে পূর্ব দিকে প্রায় ৯ কিলোমিটার সরে চাঁদপুরে এসেছে। এই বন্দরটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। এই সময় এই বন্দর থেকে পাট জাহাজে করে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হত। এটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর । চাঁদপুর বন্দর পরিদর্শন শেষে চাঁদনী রাতের জোসনার আলোতে হরিণা ঘাটে অবস্থান ছিল মনে রাখার মত। হরিণা ফেরীঘাট থেকে শরিয়তপুর ঘাটে ফেরী চলাচল করে। ফেরীতে চট্রগ্রাম হতে খুলনা ও বরিশাল রুটে যাত্রীবাহী বাস ট্রাক পারাপার হয়। অবশেষে রাত ১০ টায় আমারা ফরিদগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলাম। রাত ১১ টায় ফরিদগঞ্জ বাজারে এসে চাঁদপুরের বিখ্যাত আব্দুল আউয়ালের মিষ্টির দোকান ও বন্ধ পেলাম।

বিদায় বেলাঃ চাঁদপুর জেলায় যে সকল দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলো পরিদর্শন শেষে পরদিন সকালে লঞ্চে ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। স্মৃতির ছেড়া পাতায় আবার জমা হলো চাঁদপুরের পথে-প্রান্তরের অনেক কিছু। পিছনে পড়ে রইল মায়াময় পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মিলনস্থল চাঁদপুর মোহনা, ইলিশ চত্বরের ক্যাফে ঝীল, রূপসা জমিদার বাড়ি, চাঁদনী রাতের হরিণা ঘাট, একান্ত প্রিয় বন্ধু নিরীহ মানুষ মাহবুব স্যার, ইমদাদুল হক স্যার, রশিদ স্যার, ডাঃ ইমরান স্যার, সুমন স্যারসহ অনেক কিছু। সন্ধায় শ্যামলী বাস থামল আমাদের মনসুরাবাদ মেইন গেটের সামনে, শুরু হলো আবার যান্ত্রিক জীবনের পথ চলা।

লেখকঃ সহকারী অধ্যাপক, সাঁথিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা। ই-মেইলঃ drmidris78@gmail.com